মধ্যে অবস্থিত। এই দীঘিটির নাম দিবরদীঘি বা দিব্বদীঘি এবং গ্রামটির নামও দিবর। দিব্বোকের মৃত্যুর পর তাঁর ভাইরুদোক এবং রুদোকের পর তাঁর পুত্র ভীম বরেন্দ্রর রাজা হন। দ্বিতীয় মহীপালের কণিষ্ঠ ভ্রাতা রামপাল সামন্তদের সহায়তায় ভীমকে যুদ্ধে পরাজিত এবং নিহত করে বরেন্দ্র পুনর্দখল করেন। বর্তমান বাংলাদেশের বগুড়া জেলায় ভীমের বাঙ্গাল নামে তাঁর রাজত্বের স্মৃতিচিহ্ন আজও বিদ্যমান।

পালযুগের বিখ্যাত কবি ছিলেন সন্ধাকর নন্দী। তিনি 'রামচরিতের' রচিয়তা, পাল-আমলের অনেক কথা জানা যায় এ গ্রন্থ থেকে। 'রামচরিত' এর তৃতীয় পরিচ্ছদের নবম শ্লোকে বারেন্দ্রীর অন্তর্গত দু'টি সমৃদ্ধ নগরের উল্লেখ রয়েছে একটি স্কন্দনগর, অন্যটি শোনিতপুর। এর মধ্যে শোনিতপুর বৃহদাকার পদ্মফুল শোভিত বহু মন্দির দেবমূর্তিতে পূর্ণ ছিল। স্কন্দনগরের সঠিক অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন আছে। শোনিতপুরের হদিশ পাওয়া যায় হেমচন্দ্ররচিত অভিধানে। এই অভিধান মতে দেবীকোট, উমাবন, কোতিবর্ষ, বানপুর ও শোণিতপুর একই নগরের বিভিন্ন নাম।

'রামচরিতের' রচিয়তা সন্ধ্যাকরনন্দী নিজেকে কলিকালের বাল্মীকি বলে অভিহিত করেছেন এবং তাঁর রামচরিতকে রামায়নের সঙ্গে তুলনা করেছেন— 'রামচরিত' কাব্যের কবিপ্রশস্তিতে তিনি বলেছেন—

"অবদানং রঘুপরিবৃত গৌড়াধিপ—রামদেবয়োবেতৎ।

কলিযুগরামায়নমিহ কবিরপি কালিকাল বাল্মীকি।

এই কবির জন্মস্থান ছিল এই জেলায়, এই জেলার কুমারগঞ্জ থানার বটুন গ্রামে। তাঁর বাবার নাম ছিল প্রজাপতিনন্দী। 'রামচরিতে' অবশ্য সরাসরি বটুন নামে উল্লেখ নাই। এখানে বলা আছে—

"বসুধা শিরো বরেন্দ্রীমণ্ডল চূড়ামনিঃ কুলস্থানং,

শ্রী পৌন্ড্রবর্ধন পুর প্রতিবন্ধঃ পূণ্যাভূঃ বহদ্বটুঃ"

গবেষকদের মতে এই বহদ্বটুই হল বটুন।

দেবব্রত মালাকার নামক এক গবেষক তাঁর 'গৌড়কবি কালিদাস' নামক গ্রন্থে দাবী করেছেন যে 'রামচরিতে সন্ধ্যাকর নন্দী যে স্কন্দনগরের কথা উল্লেখ করেছেন সেটি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার আধুনিক পতিরাম। তিনি বলেছেন সংস্কৃত সাহিত্যের মহাকবি কালিদাস এই স্বন্দনগরের পণ্ডিতকূলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর প্রকৃত জন্মভূমি ছিল কৃশতর বা ক্ষীনতোয়া কালী নদীর তীরে যার বর্তমান নাম বুড়ীকালী নামান্তরে ইছামতী। এখানে বিদ্যেশ্বরী কালীমন্দির এখনও বর্তমান। তিনি আরো জানিয়েছেন যে প্রাচীন ভারতবর্ষে শাস্ত্রচর্চার মহান এই কীর্তি ভূমিতেই রাজকুমার কুমারগুপ্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে এসে কোন পন্ডিতকন্যার প্রেমপাশে আবদ্ধ হয়েছিলেন, যার পরিণতিতে জন্ম হয়েছিল স্কন্দগুপ্তের । স্কন্দগুপ্তের জন্মস্থান বলে এই পূণ্যভূমি স্কন্দনগর নামে পরিচিত লাভ করেছিল। নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে প্রথমে তিনি যুবরাজ পরে সম্রাট হিসেবে স্কন্দগুপ্ত বিক্রমাদিত্য উপাধি ধারণ করে তাঁর রাজধানী উজ্জয়িনীতে স্থানান্তর করেছিলেন। কালিদাস স্কন্দগুপ্তের সমবয়সী ও সমসাময়িক ছিলেন। স্কন্দগুপ্ত কালিদাসকেও উজ্জয়িনীতে নিয়ে গিয়েছিলেন। সুতরাং কালিদাসের সময়কাল কুমারগুপ্তের রাজত্বের শেষভাগ (৪১৫-৪৬৭খ্রীঃ) থেকে স্কন্দগুপ্তের সময়কাল পর্যন্ত অবশ্যই কালিদাস বেঁচেছিলেন এবং কালিদাসের কাব্যগাথার সিংহভাগই স্কন্দগুপ্ত বিক্রমাদিত্যকে উদ্দেশ্য করেই লেখা হয়েছিল একথা জোর দিয়েই বলা যায়। যদি আরো গবেষণার দ্বারা লেখক মালাকারের এ অনুমান সত্যি বলে প্রমাণিত হয় তবে তা হবে এ জেলার অধিবাসীদের পক্ষে যুগপৎ আনন্দ এবং গর্বের।

মুসলিম যুগের শুরু থেকে অর্থাৎ ত্রয়োদশ শতকের প্রারম্ভকাল থেকে কোটিবর্ষের জায়গায় দেবকোটি বা দেবীকোট নামটি প্রাধান্য লাভ করেছে। বঙ্গদেশে প্রথম মুসলিম অভিযানকারী ইখতিয়ারউদ্দিন বিন বখতিয়ার খলজী এতদঞ্চলে যে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন তা লখনৌতিরাজ্য নামে পরিচিত হয় এবং তার রাজধানী হয় দেবীকোটে। অর্থাৎ গঙ্গারামপুরেই ছিল বাংলার প্রথম মুসলিম রাজধানী। এটা ১২০৫ খ্রীঃ কথা, বখতিয়ার খলজি এখান থেকেই ১২০৬খ্রীঃ তিব্বত অভিযানে যান এবং ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসে এখানে অসুস্থ অবস্থায় তাঁর অধীনস্ত সেনানায়ক আলীমর্দানের হাতে নিহত হন। বানগড়ের বিপরীত দিকে পুনর্ভবা নদীর পশ্চিমপাড়ে নারায়ণপুর মৌজায় বখতিয়ার খলজীর সমাধি এখনও বর্তমান।

তবে বানগড়ের সঙ্গে জড়িয়ে আছে মহাভারতের কথা, আর সে কাহিনীই মুখে মুখে ফেরে । কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে দ্বারকাধিপতি কৃষ্ণ শিবভক্ত বান নামক এক অনার্য নৃপতির কাছে যুদ্ধ পরিহার করে শান্তির আবেদন জানিয়ে দূত পাঠিয়েছিল পৌত্র অনিরুদ্ধকে। বান ছিলেন কৌরব পক্ষের সমর্থক। তাঁর রাজধানী ছিল বানগড়, বান রাজা অনিরুদ্ধের যথেষ্ট সমাদর করলেও সন্ধিপ্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে ঘটে গেল এক অন্য ঘটনা। অনিরুদ্ধকে দেখে

বানকন্যা উষা তাঁর প্রতি আসক্ত হলেন। উভয়ের মধ্যে ঘটল হৃদয়ের আদান-প্রদান। কোনো এক শিবচতুর্দশীতে সবার অলক্ষ্যে অনিরুদ্ধ ঊষাকে অশ্বপৃষ্ঠে নিয়ে ধাবিত হলেন দ্বারকার পথে।

পরদিন প্রত্যুষে প্রাসাদসংলগ্ন বিরুপাক্ষ মন্দিরে প্রতিদিনের মত শিবপূজায় বসেছেন বান কিন্তু বারবার বিঘ্ন ঘটছে পূজায় কোনো অমঙ্গলের আশঙ্কায় তাঁর বুক দুরুদুরু। প্রাসাদে ফিরে এসে তিনি এ সংবাদ শুনে ক্রোধে ফেটে পড়লেন অনিরুদ্ধ এবং উষাকে বন্দী করে নিক্ষিপ্ত করলেন কারাগারে। পৌত্রকে উদ্ধার করতে কৃষ্ণ বিশাল সৈন্য নিয়ে ছুটে এলেন বানগড়ে। যুদ্ধে বানাসুর হলেন পরাজিত এবং নিহত। যুদ্ধে বানের এত বেশী সংখ্যক সৈন্য মারা গিয়েছিল যে তাদের দাহ করা অসম্ভব ছিল। তাই তাদের প্রত্যেকের একটি করে কর কেটে নিয়ে নিহতদের প্রতীক হিসেবে দাহ করা হয়েছিল। যে স্থানে দাহ করা হয়েছিল তার নাম হয় করদহ। স্থানটি বর্তমানে গঙ্গারামপুর থেকে কয়েক কি.মি. দূরে তপন থানায় অবস্থিত।

বানগড়ের কিছু উত্তরে একটি প্রাচীন সড়ক আছে। এর নাম উষাহরণরোড। এই রাস্তাটি কুশমন্ডী থানার রামপুরঘাটের টাঙ্গন নদী অতিক্রম করে কুশমন্ডি বাসস্ট্যান্ড ও বাজারের উপর দিয়ে গেছে। স্থানীয় লোকেদের বিশ্বাস বানরাজত্বেই এই সড়কটি নির্মিত হয়েছিল এবং এই সড়ক ধরেই অনিরুদ্ধ উষাকে হরণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন দ্বারকায়, গ্রাম্য কবিয়ালরা উষা এবং অনিরুদ্ধের প্রেম কাহিনীকে অমর করেছেন তাদের কাব্যে। একজন গ্রাম্যকবি উষার মুখ থেকে বলিয়েছেন—

"সই যখন পর হইল—পর জগৎবাসী,
পুন্নভবাৎ সাঁধে মুই আত্মা দিব ভাসি।'

সেই পুন্নভবাৎ হল পুনর্ভবা নদী যার তীরে বানগড়। জনশ্রুতি আছে যে বানরাজা বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে তর্পন করার জন্য একটি দীঘি খনন করেছিলেন। এটিই আজ কার তপন দীঘি। তপন থানায় অবস্থিত। বানরাজার দুই মহিষী ধলা এবং কালা, এদের নামে দু'টি দীঘি তিনি খনন করেছিলেন। একটির নাম ধলদীঘি এবং অপরটির নাম কালদীঘি।

এছাড়া মহাভারতের স্মৃতি বিজড়িত বিরাট রাজার প্রাসাদ আছে হরিরামপুরের বৈরাহঠা গ্রামে। গ্রামের চারদিকে আছে তিনটি বিরাট দীঘি—আলতা দীঘি, গড় দীঘি এবং মালিয়ান দীঘি, জনশ্রুতি আছে যে, এখানে যে শমীবৃক্ষ এখনও বিদ্যমান তাতে অর্জুন তাঁর গাণ্ডীব রেখে বিশ্রাম নিয়েছিলেন।

তবু অনেক কথাই বাকী রয়ে গেল। শেষ করতে করতে মনের মধ্যে সেজে উঠল রবীন্দ্রনাথের—

" দেখিতে গিয়াছি পর্বতমালা/দেখিতে গিয়াছি সিন্ধু
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া,
একটি ধানের শিষের উপরে
একটি শিশির বিন্দু।

যাদের গ্রন্থ থেকে সহায়তা নিয়েছি—

(১) ইতিহাস, সাহিত্য ও শিক্ষা—অধ্যাপক হিমাংশু কুমার সরকার

(২) উত্তরবঙ্গের ইতিহাস—সমিত ঘোষ

(৩) গৌড়রাজমালা—রমাপ্রসাদ চন্দ

(৪) উত্তরবঙ্গের ইতিহাস ও সমাজ—ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ/ডঃ নীলাংশু শেখর দাস

(৫) মধুপর্ণীউত্তরবঙ্গ সংখ্যা

(৬) বালুরঘাট বার্তা , ১৪১৮

(৭) গৌড়কবি কালিদাস—দেবব্রত মালাকার

কবি বাউল-ছাব বাউল ঃ

পথে পথে কেঁদে ফেরে প্রাণের ভৈরবী
অনন্ত তার যাত্রাসুখে জীবনের জয়গান।
জীবন এখানে পাগল প্রাণের আনন্দ, উদ্দাম, মাটির সঙ্গ-সুখ
মাটি মায়ের আপন দেশ, আমার আপন ঘর, আমার নিজের দেশ।।

—অরবিন্দ বিশ্বাস
এ. ডি. এস. আর., গঙ্গাজলঘাঁটি

Blank

''বর্ধমান''

স্নেহেন্দু ভট্টাচার্য
এ. ডি. এস. আর., মেমারী

বর্ধমান তেলার মোত আয়তন ৭০২৪ বর্গ কিঃমিঃ। তেলার অবস্থান ৮৬°৪৮´ -৮৮°২৫´পূর্ব দ্রাঘিমাংশ এবং ২২°৫৬-২৩°৫৩ উত্তর অক্ষাংশে। 'বর্ধমান' কথাতার মানে 'ক্রমেই বেড়ে চলা'। তাই তার সীমানাতা বোধ হয় ক্রমেই বেড়ে যেত। অনেক ঐতিহাসিকদের মতে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে এই বর্ধমানের নাম শুরু হয়। তার আগে এর নাম ছিল 'ঈশ্বরপুর'। তখনকার যিনি রাত্র ছিলেন তিনি তৈন ধর্মের প্রচারক 'বর্ধমান মহাবীরের' ব্যক্তিত্ব ও ধর্মীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত এবং প্রভাবিত হয়ে তার সেই রাত্তের নামকরণ করলেন 'বর্ধমান'।

'বর্ধমান' শব্দতি তৎসম, ডঃ সুকুমার সেন ভাষাতাত্ত্বিক অনুমানে এর বর্তমান রূপতি বলেছেন বড়ো আঁ। বড়ো আঁ নামে একতি গ্রাম ও আছে। তার অনুমান সেই বড়ো আঁ গ্রামতিই প্রাচীন বর্ধমান। এই স্থানতি প্রাচীন বেহুলা নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। অন্যদিকে ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল বোড়ো ও ডোম তাতির বাসস্থান হিসাবে নাম ছিল বোড়ো-ডোমান—একতি অস্ত্রিক ভাষাভাষি শব্দ এরই সংস্কৃতায়িক রূপ 'বর্ধমান'।

রাঢ়ের মধ্যবর্তী তেলা বর্ধমান। তেলার পূর্বভাগ ভাগীরথী, দামোদর, অত্তয় নদ প্রবাহিত বিস্তীর্ণ অঞ্চল। যার মাতিও খুব উর্বর। উন্নত কৃষিপ্রধান তমি। অন্যদিকে পশ্চিমাঞ্চল খনি ও শিল্পাঞ্চল। যার মধ্য দিয়ে দামোদর, অত্তয়, বরাকর নদী প্রবাহিত। স্বাভাবিক ভাবে কৃষি ও শিল্প উভয় ক্ষেত্রেই এই তেলা ভারতবর্ষের মধ্যে একতি নত্তিবিহীন উন্নত তেলা।

বর্তমান বর্ধমান তেলা বৃতিশ আমলে সৃষ্ট। বহুবার এর সীমানা পরিবর্তিত হয়েছে। হিন্দু যুগে বর্ধমান ভুক্তির সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমভাগে মহারাতবিত্তয়সেনের মল্লসারুল লিপিতে। গলসী থানার দামোদরের নিকতবর্তী মল্লসারুল গ্রামে এই তাম্রলিপিখানি পাওয়া গেছে। এর পরবর্তী কালের একাধিক লিপিতেও বর্ধমান ভুক্তি ও বর্ধমানপুরের উল্লেখ রয়েছে। এই বর্ধমান ভুক্তি বর্তমান বর্ধমান বিভাগের এক বিরাত অংশ তুড়ে বিস্তৃত ছিল।

বর্ধমানের ইতিহাস খুবই প্রাচীন। এ পর্যন্ত যে সমস্ত নিদর্শন পাওয়া গেছে তা থেকে ধারণা করা যায় খৃষ্ট পূর্বাব্দেও বর্ধমানে তনপদের সন্ধান মিলেছে। তৈন 'কল্পসূত্র', সোমদেবের 'কথা সরিৎ' প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে উল্লেখ আছে তৈন আচরণ সূত্রে উল্লিখিত সুক্ষ্মভূমিই 'বর্ধমান'। ষষ্ঠ শতাব্দীতে রচিত বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায় বর্ধমানপুরের উল্লেখ পাওয়া যায়।

বর্ধমানের ইতিহাসে মুঘল আমলে মুঘল শাসনে আকবরের আমলে মেহেরুন্নিসাকে কেন্দ্র করে কুতুবুদ্দিন ও শের আফগানের যুদ্ধ ও মৃত্যু আতও পাশাপাশি সমাধি দুতি সাক্ষ্য বহন করছে। সপ্তদশ শতকের শেষ দিকে পাঞ্জাবের লাহোর থেকে ব্যবসার উদ্দেশ্যে আসা সঙ্গম রায় এর পুত্র অনুরায় কোতোয়াল হন। তার পুত্র বাবুরায় তমিদার হন। পরবর্তী সময়ে রাত্ত হন কৃষত্তরাম, ত্তাৎরাম, চিত্রসেন, কীর্তিচাঁদ, তিলকচাঁদ, বনবিহারী কাপুর, বিত্তয়চাঁদ, উদয়চাঁদ প্রমুখ। এদের নিয়ে বর্ধমানের বহু কাহিনী রয়েছে। ১৭৪২ সালে নবাব আলিবর্দী খাঁ এর আমলে বর্গী আক্রমনের বিবরণ আত ও শিহরণ ত্তগায়। মধ্যযুগে বর্ধমানের ইতিহাসে একতি উল্লেখযোগ্য দিক হলো শ্রী চৈতন্যর আবির্ভাব। নবদ্বীপের পাশ্ববর্তী অঞ্চল কালনা, বাথনাপাড়া, কাতোয়া, শ্রীখণ্ড প্রভৃতি স্থানগুলি আতও বৈষত্তব সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসাবে চিহ্নিত রয়েছে।

বস্তুতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙলায় বর্ধমান একতি বড় স্থান অধিকার করে আছে। সমসাময়িক দলিল দস্তাবেত, দিল্লীর ফরমান, সাহিত্য স্মৃতিচিহ্ন সমূহ এ শতাব্দীর বর্ধমানের অনেক কথা বলছে গবেষকের কানে কানে। কীর্তিচাঁদের পরবর্তী রাত্তরাও মুঘলসম্রাত মহম্মদ শাহ, আহম্মদ শাহ এবং দ্বিতীয় শাহ আলমের কাছ থেকে ফর্মান এর পর ফর্মান এনে নিত্তেদের শক্তি ও পদমর্যাদা দৃঢ়তর করেছেন। ১৭৬৪, তার পদমর্যাদা বেড়ে মহারাত্তধিরাতে দাঁড়ানো এবং তিনি হলেন 'পাঁচহাত্তরী ত্তত' বা মনসবদার, যার নিয়ন্ত্রণে থাকবে অতিরিক্ত তিন হাত্তর অশ্বারোহী সৈন্য। তার থাকবে কামান বন্দুক, থাকবে করদ মিত্ররাত্তর সকল সম্মান ও ক্ষমতা । এ সম্মান বত্তয় ছিল ১৭৯৩ খৃঃ পর্যন্ত।

১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিসের শাসনকালে এল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং প্রায় স্বাধীন বর্ধমানের মহারাত্তধিরাত হলেন রাতস্ব প্রদানকারী বড় একত্তন তমিদার মাত্র। মহারাত তেত্তাঁদ (১৭৭১সালে) একদা মাত্র দু বৎসর বয়সে পিতা

তিলকচাঁদের বিশাল রাজ্য ও মর্যাদার উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। ২১ বৎসর পরে তার রাজ্যও রইল, নামের মর্যাদা ও রইল কিন্তু আসল রাজকীয় ক্ষমতা হল লুপ্ত। অবশ্য ইংরেজ রাজত্বে জমিদার হয়েও বর্ধমান করদমিত্র রাজাদের মত মর্যাদা লাভ করেছেন। প্রকৃত পক্ষে তার জমিদারী অনেক দেশীয় রাজ্যর থেকে বড় ছিল। ইংরেজ বাহাদুরের দরবার, জাতীয় সভায় তার ছিল মর্যাদার আসন। ১৯১৮ সালের একতি হিসাবে দেখতে পাই, বর্ধমান রাজএস্তেত চার হাজার বর্গমাইলের বেশী ভূখণ্ড জোড়া। প্রায় ২০ লক্ষ তার অধিবাসী। নানা পর্যায়ের প্রজাস্বত্বভোগী তারা।

বর্ধমান রাজ পরিবারের ইতিহাস আলোচনা করতে হলে আমরা ফিরে যাই খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে। বর্ধমানের সুবাদারপত্নী নূরজাহান পতি জাহাঙ্গীরের রাজত্ব শেষ হয়ে, বাঙলাদেশের বিদ্রোহ দমনে দিল্লী থেকে মোঘল সৈন্য এসেছে এই অঞ্চলে। বিশেষ করে পাঠানদের দমন করবার জন্য। মোঘল সৈন্যদের সাহায্য করে সাহসী ধীর আবুরায় পুরস্কার হিসাবে পেলেন বর্ধমানে ভুক্তি ফৌজদারের অধীনে কোতওয়ালা ও চৌধুরী পদ। সামান্য সংখ্যক সৈন্য তার অধীনে রাখতে পারলেন। এই সামান্য সংখ্যক সৈন্য ও চৌধুরীর পদ নিয়ে হল বর্ধমান রাজের ভিত্তি—সে হল ১৬৫৭ খৃঃ এর কথা।

আবুরায়ের পিতামহ সঙ্গম রায়-পাঞ্জাব প্রদেশের কোতলি নিবাসী ক্ষত্রীয় উপাধিধারী ব্যবসায়ী খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে— এক সঙ্গে রথ দেখা ও কলা বেচার উদ্দেশ্যে এসেছিলেন শ্রীক্ষেত্র এবং পরে বাঙলাদেশে। বর্ধমানের উপকণ্ঠ বৈকুণ্ঠপুর ছিল তখন সমৃদ্ধ গ্রাম। সেখানেই তিনি বাস করলেন। তাঁর ব্যবসা ছিল অসময়ে মানুষকে তাকা ধার দেওয়া এবং শস্য ক্রয় বিক্রয় করা। তার পুত্র বঙ্কু রায় ও এই ব্যবসা করেন এবং পৌত্র আবুরায় এই ব্যবসায় প্রভুত উন্নতি করেন এবং তদানীন্তন শাসক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেও সক্ষম হন। ঠিকমতো বলতে গেলে বলতে হয়—ভারত বিখ্যাত এই জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠা হয় এই সময়।

সঙ্গমরায় (বৈকুণ্ঠপুরে বাস করেন এবং পাঞ্জাব থেকে আসেন)
↓
বঙ্কু বিহারী রায়
↓
আবু রায় (প্রথম চৌধুরী পদ প্রাপ্ত হন)
↓
বাবু রায় (বর্ধমানে বাস করেন)
↓
ঘনশ্যাম রায়
↓
কৃষ্ণরাম রায়
↓
জগৎরাম রায়
↓

কীর্তিচন্দ রায় → চিত্রসেন রায় (প্রথম রাজা) (নিঃসন্তান ছিলেন)

মিত্র সেন রায় → তিলকচন্দ রায় → তেজচন্দ রায়

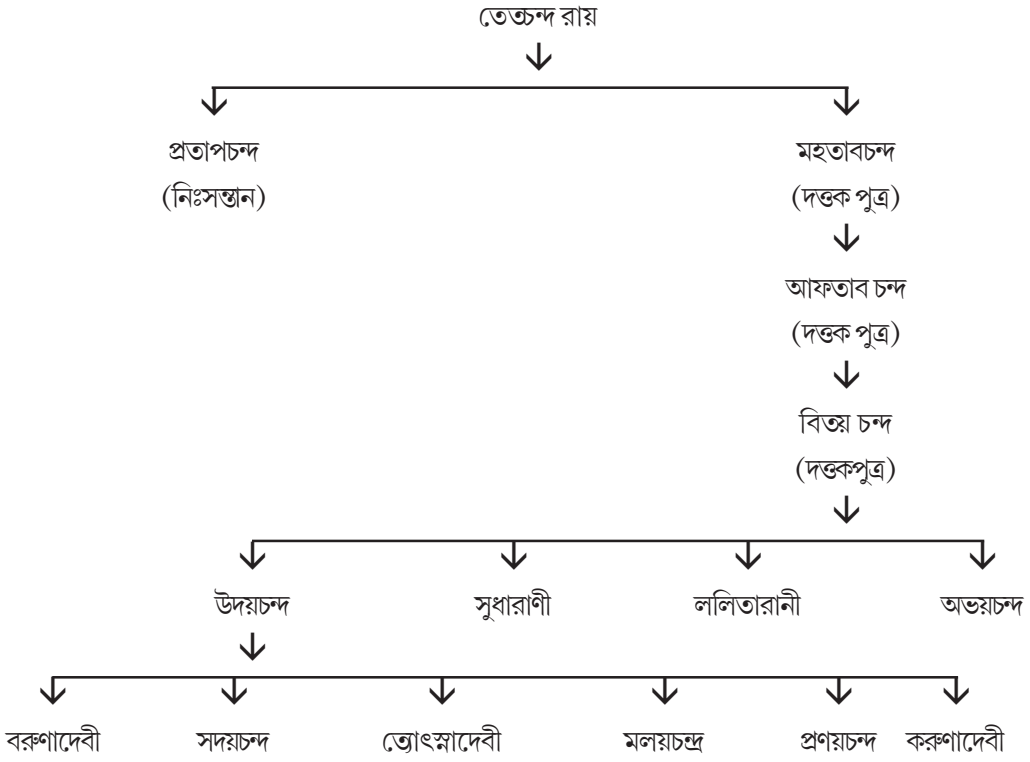

বর্ধমান রাজপরিবারের উল্লেখযোগ্য রাজাদের মধ্যে বিজয়চন্দ্র ১৮৮১ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। তিনিই প্রথম ইংল্যান্ড যান। বিজয়চন্দ সাহিত্যানুরাগী ছিলেন এবং নিজে অনেক সংগীত, নাটক প্রবন্ধ রচনা করেছেন। দানে ও দয়ায় বিজয়চন্দ রাজর্ষি ছিলেন বলে বর্ধমানের বিভিন্ন শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের উন্নতি ও অনেক প্রতিষ্ঠানে আর্থিক সাহায্য করেন। বর্ধমানে মেডিকেল স্কুল, টেকনিক্যাল স্কুল তাঁরই প্রচেষ্টায় গঠিত হয়। এক কথায় তাঁরই সময় বর্ধমানের সর্বাঙ্গীন উন্নতি হয়। সকল বিষয়ে তিনি সত্যকারের রাজা ছিলেন। ১৯৪১ খৃঃ তিনি পরলোক গমন করেন। বিজয়চন্দর দুই পুত্র উদয়চন্দ ও অভয়চন্দ। তাঁর মৃত্যুর পর উদয়চন্দ রাজা হন এবং বিশাল সম্পত্তির অধিকারী হন। উদয়চন্দ এই বংশের শেষ মহারাজাধিরাজ কারণ তাঁরই আমলে সমগ্র জমিদারী সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়। দেশের বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে উদয়চন্দ জড়িত থাকেন এবং বর্ধমানের বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠান তাঁরই দানে গঠিত হয়েছে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, উদয়চন্দ মহিলা বিদ্যালয়, বিজয়চন্দ ইনস্টিটিউট তারই দানে প্রতিষ্ঠিত।

বর্তমানে বর্ধমান এবং জেলার বিভিন্ন অংশে যা দেখার ও জানার জন্য মানুষের মনে কৌতুহল জাগায় সে সম্পর্কে সংক্ষেপে উল্লেখ করা যেতে পারে। বর্ধমান শহরটি একটু ঘুরে নেওয়া যেতে পারে। বর্ধমান ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে বাঁদিকে জি. টি. রোড ধরে একটু এগিয়ে গিয়ে ডানদিকে বিজয়তোরন (পূর্ব নাম 'কার্জনগেট')। ১৯০৪ খৃঃ মহারাজবিজয়চাঁদ লর্ড কার্জনের বর্ধমান আগমন উপলক্ষ্যে নির্মান করেন। অপর দিকে অফিস আদালত, অরবিন্দ ভবন। আর একটু এগিয়ে বাঁ দিকে বংশগোপাল টাউনহল, তারপর এগিয়ে গেলে বাঁদিকে কালীবাড়ী। পাশে বাঁকা নদী। ওখান থেকে ডানদিকে সোজা তেলমারুই রাস্তা গিয়েছে সর্বমঙ্গলা মন্দিরে। প্রতিষ্ঠিত এই দেবী সপ্তদশ শতাব্দী থেকে বর্ধমানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হিসাবে পূজিতা হয়ে আসছেন। ওখান থেকে এগিয়ে গেলে আকবরের সমসাময়িক সাধক পীরবাহারম খক্কর এর সমাধি। এরপর যাওয়া যাবে শের আফগান কুতুবউদ্দিনের সমাধি। এখানে লুকিয়ে আছে মেহেরুন্নেসার কাহিনী। ডান দিকে গেলে প্রাচীন বাণিজ্য কেন্দ্র নতুন গঞ্জ, আলমগঞ্জ। এর পাশে রয়েছেন বর্ধমানেশ্বর শিব। ১৯৭২খৃঃ আবিষ্কৃত হয়েছে খুবই প্রাচীন মূর্তি এবং একটি শিল্পকলার নিদর্শন। একটু ফিরে কোতাল হাতে কমলাকান্তর কালীবাড়ী, বর্ধমান মহারাজ তেজচাঁদ সাধক কমলাকান্তকে গুরুপদে অধিষ্ঠিত করে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এর পর মহন্তের অস্থল, রথতলা হয়ে কাঞ্চন নগর

যাওয়া যেতে পারে। ওখানে রয়েছেন দেবী কঙ্কালেশ্বরী। প্রাচীন মূর্তি এবং এরূপ ভাস্কর্য এ শিল্পের বড় আশ্চর্য নিদর্শন—যা খুব কম আছে। ওখান থেকে ফিরে যাওয়া যেতে পারে খাজা আনোয়ার বেড়। ১৬৯৭ খৃঃ ঔরঙ্গজেবের পৌত্র আজিশশান এর মন্ত্রী খাজা আনোয়ার ও রক্ষীদের সমাধি ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে রয়েছে। ওখান থেকে ফিরে রাজবাড়ী যাওয়া যেতে পারে। রাজবাড়ীর কিছু অংশে বর্তমানে মহিলা মহাবিদ্যালয়। কিছু অংশ সরকারী অফিস ও মূল অংশে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে। রাজবাড়ীর পশ্চিমে আজিশ্‌শানের মসজিদ রয়েছে। এরপর কৃষ্ণসায়র, গোলাপবাগ এবং সুরম্য প্রাকৃতিক পরিবেশ যা অতীতে ছিল রাজরাজাদের বিশ্রাম বিলাসের স্থান। বর্তমানে বিশ্ব বিদ্যালয়ের পঠন পাঠন কেন্দ্র। এর পাশাপাশি বর্তমান কালে গড়ে উঠেছে প্রাকৃতিক উদ্যান, বিজ্ঞান কেন্দ্র, তারামণ্ডল, মৃগ উদ্যান। এরপর তিতি রোড ধরে পশ্চিমদিকে দু কিমিঃ গিয়ে ডান দিকে ১০৮ শিবমন্দির। মহারানী বিষুত্কুমারী ১৭৮৮খৃঃ এই মন্দির গুলি নির্মান করেন। এই বর্ধমান শহরের মধ্যে রয়েছে শ্যামসায়র, রানীসায়র এর মতো পুষ্করিনী এবং দেবদেবীর মন্দির। শ্রী শ্রী লক্ষ্মীনারায়ণজীউ ঠাকুর বাড়ী, শ্রী শ্রী রাধা বল্লভজীউ ঠাকুর বাড়ী, শ্রী শ্রী ধনেশ্বর দেবী ঠাকুর বাড়ী, দুর্লভা কালী, শ্রী শ্রী ভুবনেশ্বরী দেবী মন্দির, সোনার কালীবাড়ী, তেজগঞ্জ কালী, ভৈরবীকালী, ঈশানেশ্বর শিব প্রভৃতি বহু দেবদেবীর মন্দির ছাড়াও বর্ধমান শহরের মধ্যে শ্যামসায়র, রাণীসায়র এর মতো পুষ্করিনী বর্তমান। এছাড়া তিতি রোডের ধারে শিখ সাম্প্রদায়ের গুরুদ্বার আর একতু গিয়ে খ্রীস্তানদের চার্চ এবং ঢল দীঘির পাড়ে ১৭১৬ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত পূরানী মসজিদ।

বর্ধমান জেলার পশ্চিম দিকে কৃষিতে অনুর্বর এবং অতীতের বনাঞ্চল পূর্ণ দুর্গাপুর আসানসোল এলাকায় জঙ্গল কোতে বর্তমান জনবসতি গড়ে উঠেছে। এখানে ছড়িয়ে রয়েছে প্রাগৈতিহাসিক যুগের আর্য-অষ্ট্রিক-দ্রাবিড় জতির ইতিহাসের নিদর্শন। মানভূমের পাদদেশে এই অঞ্চলতি একতি মিশ্র সংস্কৃতি কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠেছে। দক্ষিণে দামোদর এবং উত্তরে অজয় নদ। মাঝে লুনিয়া নদী বেষ্টিত ও বিধৌত কাঁকসা, দুর্গাপুর, ফরিদপুর, অন্ডাল, রানীগঞ্জ, আসানসোল। কুলতি বরাকর নিয়ে একতি 'ব' দ্বীপের আকার নিয়েছে। দামোদরে বাঁধ নির্মান দুর্গাপুরে কারখানা গড়ে উঠতে যেমন সাহায্য করেছে, তেমনিই রানীগঞ্জ-আসানসোল অঞ্চলে কয়লাখনি এলাকাতিকে সমৃদ্ধ করেছে। এ অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলির কয়েকতি উল্লেখ করা যেতে পারে। পানাগড়ের কাছে দামোদরের তীরে চম্পাই নগর। যেখানকার কিংবদন্তীর মধ্যে চাঁদ সওদাগরের বাণিজ্য ও তার প্রতিষ্ঠিত দুতি শিবের কাহিনী রয়েছে। শৈব ও শাক্ত ধর্মের কেন্দ্র ভূমি মানকরে পুরাকীর্তির বহু নিদর্শনের মধ্যে গ্রাম দেবতা মানিকেশ্বর শিব, মল্লিকেশ্বর ও বুড়া শিবের মন্দির। পাশেই অমরার গড়ে আনন্দময়ী কালীর পাথরের প্রতিমা ও মন্দির, গোপভূম পরগণার সদগোপ রাজাদের স্মৃতি চিহ্ন, হংসেশ্বর শিবের মন্দির, পঞ্চমুণ্ডির আসন, পঞ্চকালী, বড়কালী, প্রভৃতি অন্ডাল থেকে অনতিদূরে খাঁন্দারায় রাধামাধবের পঞ্চরত্ন মন্দির, গৌরাঙ্গ মন্দির, নীলকন্ঠ শিবের মন্দির, ভুবনেশ্বরের মন্দির, গিরিধারী মন্দির প্রভৃতি উখরায় বিভিন্ন মন্দির ভাস্কর্য, বৈষ্ণব সংস্কৃতির নিদর্শন রথযাত্রা ও প্রাচীন বর্ধিষুত বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র হিসাবে খ্যাত। দামোদরের তীরে রাণীগঞ্জ কয়লাখনি ও শিল্পাঞ্চল হিসাবে গড়ে উঠলেও এখানকার গীর্জা, রোনাইরোডে পীরের দর্গা, সিয়ারসোলের রথযাত্রা, সত্যনারায়ণ মন্দির, সীতারাম মন্দির, সীতা ও মহাবীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রানীগঞ্জ সিউরি রাস্তায় পাণ্ডবেশ্বর পঞ্চশিবের মন্দির আছে, শোনা যায় পাণ্ডবেরা অজ্ঞাত বাসের সময় এখানে কিছুদিন ছিলেন। আসানসোলের বাইরে ঘাগড়বুড়ী(চন্ডী) উৎসব ও মেলা, জমুড়িয়ার কাছে দামোদরপুরে আদিবাসী সম্প্রদায়ের ছাতা পরব অনুষ্ঠান। কবি নজরুলের জন্মস্থান চুরুলিয়ায় অজয়ের তীরে সেরগড় পরগণায় হিন্দু আমলে একতা দুর্গ ছিল, মুসলমান আমলে সেখানে মসজিদ ও বাড়ীঘর নির্মিত হয়েছে। জেলার পশ্চিম প্রান্তে বরাকর নদীর তীরে বরাকর বেগুনিয়ার সুউচ্চ শিখর দেউল সহ বেশ কয়েকতি মন্দিরের স্থাপত্য ভাস্কর্য, সীতারাম দাসের গৌরাঙ্গবাড়ী আশ্রম, নদী থেকে সংগৃহীত প্রাচীন বহু মূর্তি, ব্রাহ্মণী দেবীর মূর্তি প্রভৃতি ইতিহাসের নিদর্শন। এখান থেকে মাত্র দুই কিঃমিঃ দূরে কল্যানেশ্বরী মন্দিরর প্রতিষ্ঠার সঙ্গে শিখর ভূমের রাজার গুরু দেবনাথ দেওঘরিয়ায় নাম এবং পরবর্তী সময়ে সংস্কারের ক্ষেত্রে কাশীপুরের রাজা বিক্রম সিংহের নাম জড়িয়ে

আছে, বরাকরের সন্নিকতে ডিসেরগড়ে ছিন্নমস্তা দেবীর মন্দির, পীরের স্থানে উরস্ উৎসবের কথা প্রভৃতি বহু বিষয় রয়েছে যেগুলি যথার্থ ভাবে অনুসন্ধানের দাবী রাখে।

বর্ধমানের দক্ষিণাঞ্চল যেতির উত্তর ও পূর্ব দিকে দামোদর নদ, পশ্চিমে আংশিকভাবে দ্বারকেশ্বর, দক্ষিণে মুণ্ডেশ্বরী নদী এবং মাঝে কয়েকতি খাল বেষ্টিত ও বিধৌত কৃষি নির্ভর এলাকা। কিন্তু এ অঞ্চলে আদিম সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিদর্শন হিসাবে বহু বিষয় উল্লেখের দাবী রাখে। রায়না একতি প্রাচীন গ্রাম যেখানে একদা বাগদিদের প্রাধান্য ছিল। শিখর দীঘির মতো এখানকার বিভিন্ন দীঘি ও প্রাচীন মূর্তিগুলি রায়নার অনতিদূরে রামবাতি গ্রামে রামসীতার মন্দির, রায়নার পূর্ব দিকে প্রাচীন গ্রাম শ্যামসুন্দর-এ (প্রাচীন নাম আহার বেলমা) পরিখাবেষ্টিত রাত্বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ, 'রাত্মাতার দীঘি' ধর্মমঙ্গলের কবি রামকান্ত রায় এর বাড়ী সোহারায়, বুড়ো রায় নামের ধর্মরাত্, বর্ধমান আরামবাগ রাস্তায় উচালন গ্রামের প্রাচীন ঢিবি, ডাঙ্গা, মন্দির, মসত্দি, দীঘিগুলি এমনকি মোগলমারী নামতির মধ্যেও সম্ভবতঃ ইতিহাসের ইঙ্গিত, কোত শিমূল, হসিদপুর, গোতান তৈলপাড়া দামিন্যা প্রভৃতি গ্রাম প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিদর্শন। মুণ্ডেশ্বরী নদীর তীরে পাইতা গ্রামে কালীপূত্র, ধর্মঠাকুরের পূত্র প্রভৃতি, বোড়ো গ্রামে বলরাম ও পার্শ্ববর্তী গ্রাম ধামাস সম্পর্কে ডঃ সুকুমার সেন, ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল প্রমুখ বিদগ্ধ ব্যক্তিগত যে আলোচনা করেছেন তা থেকে ইন্দোমোঙ্গল গোষ্ঠীর বসবাস এ অঞ্চলে ছিল বলে অনুমান করা হয়েছে। রায়নার অনতিদূরে ধর্মমঙ্গলের কবি রূপরাম চক্রবর্তীর গ্রাম শ্রীরামপুর (কাইতি) গ্রামে ত্যদুর্গা। রক্ষাকালী, গঙ্গাধর, শিব, যাত্রাসিদ্ধি ধর্মঠাকুর। পঞ্চমুণ্ডির আসন প্রভৃতি, কাইতির ধর্মপূত্রর সূত্র ধরে ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল কর্তৃক আলোচিত তথ্যাবলী, আচার্য সুনীতি চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক উক্ত অঞ্চলে কিরাত তনগোষ্ঠীর বসবাসের ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। নাড়ুগ্রামের ধর্মপূত্র ও প্রাচীন নিদর্শন যেতিকে ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল কিরাত তনগোষ্ঠীর বসবাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে মনে করেছেন, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের রচয়িতা মুকুন্দরামের ত্মস্থান গোতানের দেউল পোতা ঢিবি যেখানে পুরাবস্তুর নিদর্শন মিলতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। দামিন্যা গ্রামের প্রাচীন মন্দির ও মূর্তির ধ্বংসাবশেষ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহশালায় রক্ষিত রয়েছে। বর্ধমান বাঁকুড়া রাস্তায় খণ্ডঘোষ গ্রামে বুড়োরাতশিব, রতন্তীকালী, মদনগোপাল, রাধাবল্লভত্রী, কমললোচন ধর্মঠাকুর প্রভৃতি দেবদেবীর মূর্তি, মন্দির পূত্র, উৎসব ইত্যাদি। বোঁয়াই এর গ্রাম্য দেবী বোঁয়াই চণ্ডী বসন্ত রোগের দেবী হিসাবে খ্যাতি বহু দিনের। সেহারা থেকে কিছুতা দূরত্বে মীর্তপুর গ্রামে মোগলদের ঘাঁতি ছিল, এখানে এখনও প্রাচীন মসত্দিের ধ্বংসাবশেষ ও পীরের উরস্ উৎসব পালন প্রভৃতি বহু বিষয় রয়েছে যেগুলির অনুসন্ধান চালানো আশু প্রয়োতন এবং এর মধ্যে লুকিয়ে থাকা প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে খুঁতে পাওয়া সম্ভব হবে।

২০১১ সালের তনগননা অনুযায়ী বর্ধমান তেলার মোত তনসংখ্যা ৭৭২৩৬৬৩ তন । গত ১৬ই এপ্রিল ২০১২ তারিখে বর্ধমানে তেলা প্রশাসনের সঙ্গে সর্ব রাতনৈতিক দলের বৈঠকে পাঁচ মহকুমার (বর্ধমান সদর, কাতোয়া, কালনা, দুর্গাপুর ও আসানসোল) এই তেলাকে দুই ভাগে (শিল্পাঞ্চল ও কৃষি ভিত্তিক এলাকার ভিত্তিতে) দুই ভাগে ভাগ করার সর্বসম্মতি ক্রমে সিদ্ধান্ত হয়েছে। আগামী অদূর ভবিষ্যতে পশ্চিমবঙ্গ এর ভৌগোলিক মানচিত্র থেকে 'বর্ধমান' তেলার নাম লুপ্ত হয়ে নতুন দুতি তেলা হিসাবে বিভক্ত হয়ে অধুনা বর্ধমান তেলা আত্মপ্রকাশ করবে এই আশা করা তেতেই পারে।

সুন্দরীর বনে

প্রিয়া মুখার্জী

এ. ডি. এস. আর., কদম্বগাছী

সুন্দরবন —এই নামটা বরাবরই আমাকে আকৃষ্ট করেছে। ছোটবেলায় মনে হতো অদ্ভুত নাম—এ নামের মানে কি? তাহলে, বনটা কি খুব সুন্দর? এই নামকরণ হয়তো এসেছে 'সমুদ্রবন'-এই শব্দটির অপভ্রংশ থেকে। সমুদ্রবন—অর্থাৎ সমুদ্র সন্নিহিত বন, ভৌগোলিক অবস্থান বিচারে যা যথাযথ। আবার অনেকে মনে করেন মনসা মঙ্গল কাব্যের অন্যতম চরিত্র চাঁদ সদাগর 'সুন্দরবন' নামের রূপকার। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মতে এই অঞ্চলে সুন্দরী গাছের আধিক্যের জন্য এখানকার নামকরণ হয়েছে সুন্দরবন। নাম মাহাত্ম্যের পর আসা যাক স্থানমাহাত্যে। পদ্মা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা নদীর ব-দ্বীপ অঞ্চলে গঠিত এটি বৃহত্তম একক ম্যানগ্রোভ অরণ্য। ভারত এবং বাংলাদেশ এই দুই দেশজুড়েই এর অবস্থান, আয়তন প্রায় ৬০০০ বর্গ কিমি। সমগ্র ম্যানগ্রোভ অরণ্যের প্রায় ৮১% অংশ বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্ভূক্ত এবং প্রায় ১৯%অংশ ভারতবর্ষের অন্তর্গত। পুরো অঞ্চলটাই নদী-নালা-খাল-খাঁড়ি-জলাজমি, জোয়ারের সময় সমুদ্রের নোনাজলে নীচু কাদাবন প্লাবিত হয়। ভাঁটার সময় জল চলে গেলেও রেখে যায় তার ছাপ—তীরবর্তী গাছের গোড়া এবং নীচুজমি কর্দমাক্ত হয়ে থাকে। সুন্দরবনের প্রায় ৪১১০ বর্গ কিমি অঞ্চল নদী-নালা-খাঁড়ি দ্বারা গঠিত এবং প্রায় ১৭০০ বর্গ কিমি অঞ্চল স্থলজমি দ্বারা গঠিত।

Tiger Reserve হিসাবে বিশ্ব মানচিত্রে সুন্দরবনের প্রবেশ ১৯৭৩ সালে। ১৯৭৬ সালের সজনেখালিতে Wild Life Sanctuary গঠিত হয়। এখানে প্রায় ২৭০ প্রজাতির পাখি, ৪২ প্রজাতির স্তন্যপায়ী, ৩৫ প্রজাতির সরীসৃপ এবং প্রায় ৮ প্রকারের উভচরের প্রজাতির দেখা মেলে। এর মধ্যে রয়েল বেঙ্গল টাইগার সুপ্রসিদ্ধ। ভারতবর্ষের অনেক জায়গাতেই বাঘের দেখা মেলে, কিন্তু এখানকার বাঘ তাদের বুদ্ধিমত্তা, ক্ষিপ্রতা এবং অগ্রাসী মনোভাবের জন্য সুপরিচিত। শিকারীদের মতে সুন্দরবনের বাঘ হল পৃথিবীর সবচেয়ে বুদ্ধিমান এবং বলশালী প্রাণী। এদের চরিত্র অন্যান্য ব্র্যাঘ্রকূলের থেকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক। এরা সম্পূর্ণ নিঃশব্দে পিছন থেকে আক্রমণ করে শিকারের ঘাড় লক্ষ্য করে। বয়সের ভারে আক্রান্ত হয়ে পড়লে অথবা কোন আঘাত জনিত কারনে অক্ষম হয়ে পড়লে জঙ্গলের নিকটবর্তী গ্রামে বাঘের আক্রমণে মানুষের প্রাণহানি ঘটে। সুন্দরবনের বাঘের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল একবার ভক্ষণের পর 'বড়মিঞা' অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার শিকারের অর্ধভূক্ত দেহের কাছে সাধারণত ফিরে আসে না। 'বড়মিঞা'-র গল্পে আবার পরে ফিরে আসা যাবে।

এখানকার ইতিহাস বেশ পুরোন। জনশ্রুতি অনুযায়ী মনসামঙ্গল প্রসিদ্ধ চাঁদ সদাগরের এই অঞ্চলে শহর তৈরী করেছিলেন। তার তৈরী শহরের ধ্বংসাবশেষ বাঘমারা ব্লকে পাওয়া গেছে। মুঘল সম্রাটরা স্থানীয় বাসিন্দাদেরকে এই অঞ্চল লীজ দিয়েছিল, জনশ্রুতি অনুযায়ী আকবরের সেনাবাহিনীদের হাত থেকে বাঁচার জন্য দুষ্কৃতিরা এই অঞ্চলে আশ্রয় নেয়। সতেরো শতকে এখানে পুর্তগীজ জলদস্যু, নুন-মাফিয়া, ডাকাত, প্রভৃতিদের অনুপ্রবেশ ঘটে। ব্রিটিশ শাসনের অধিকাংশ সময়ে সুন্দরবন অঞ্চল উপেক্ষিত থেকে গিয়েছে। ১৮৭৫-৭৬ সালে এই বনাঞ্চলের একটা বড় অংশ 'রিজার্ভ ফরেস্ট' হিসাবে ঘোষিত হলেও দুর্গম প্রভৃতি, বিপদশঙ্কুল পরিবেশ এবং যোগাযোগের অপ্রতুলতার কারণে এই অঞ্চলের প্রকৃত সংরক্ষণ ব্রিটিশ আমলে হয়নি।

সুন্দরী গাছের সারির জন্যই এই বনের নাম সুন্দরবন হয়েছে এমনটাই শোনা যায়। অগণিত শাখানদী, ছোটনদী এবং খাল মাকড়সার জালের মত ঘিরে রয়েছে এই ব-দ্বীপকে। তারপর খাল এবং নদী থেকে বনের ভিতর শত শত পাশ-খাল এবং খাঁড়ি বেরিয়ে গেছে। এই অঞ্চলের প্রধান যান ডিঙি এবং ছোট নৌকা, যা দিনে চারবার জোয়ার -ভাঁটার হিসাব মেনে চলে। এই বনানীর তিন ভাগের একভাবই জল এবং লবণাক্ত। বাংলার সাগর উপকূল বরাবর পূর্ব -পশ্চিমে ১৫০ মাইল, উত্তর-দক্ষিণে কোথাও কমবেশী ৫০ মাইল, দক্ষিণ ২৪ পরগণার আবাদ এলাকার সাগর কূল বরাবর এই অংশের পূর্ব সীমানা রায়মঙ্গল নদী এবং পশ্চিমের সীমানা বলা হয় সাগর-সঙ্গমের পীটভূমি পর্যন্ত। দক্ষিণবাহী নদী ভাগীরথীর মিষ্টি জল এবং জোয়ার ভাঁটার ফলে বেশী পরিমাণ লবণাক্ত জলের উপস্থিতি সমগ্র অঞ্চলের নদ-নদী এবং প্রাকৃতিক জলের উৎসকে